চতুর্থ অধ্যায়

আখলাক

প্রিয় শিক্ষার্থী!

ইতোমধ্যে তুমি আখলাক ও এর প্রকারভেদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেয়েছ। পূর্বের শ্রেণিতে কতিপয় আখলাকে হামিদাহ ও আখলাকে যামিমাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদেরকে কিন্তু আখলাকে হামিদাহ ও আখলাকে যামিমাহ সম্পর্কে কেবল বিস্তারিত জানলেই চলবে না, জানার সাথে সাথে আখলাকে হামিদাহগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কথা, কাজ, চলা-ফেরা, আচার-ব্যবহার, লেন-দেন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। আর আখলাকে যামিমাহগুলো আমাদেরকে বর্জন করে চলতে হবে। আমাদের স্বভাব ও আচরণে যেন কোনো আখলাকে যামিমাহ অনুপ্রবেশ করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে কলুষিত না করতে পারে সে ব্যাপারে সর্বদা সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, মুসলমানরা একসময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণায় যেমন বিশ্ব সভায় উচ্চ আসনে আসীন হয়েছিলো, তেমনি উত্তম চরিত্র এবং উন্নত আদর্শের ক্ষেত্রেও মুসলমানরা এ বিশ্বের বুকে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলো।

তোমরা জানো, ইসলাম মানুষের সৎচরিত্রের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। ইসলাম উত্তম চরিত্রের অধিকারি ব্যক্তিকে সর্বোত্তম মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে তো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা 'সুমহান চরিত্রের অধিকারী' বলে সত্যায়ন করেছেন। আবার উত্তম চরিত্র প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতাদানের জন্যই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।' মহানবি (সা.)- এর এ বাণী থেকে আমরা উত্তম চরিত্রের গুরুত্বের কথা সহজেই অনুধাবন করতে পারি। তাই, মহানবি (সা.) ও মহান চরিত্রের অধিকারী আমাদের অন্যান্য পূর্বসূরীদের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আবার আমরা বিশ্ব মানব সভ্যতায় উত্তম চরিত্র ও আদর্শের রোল মডেল হতে চাই। অন্যান্য জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় এবং ধর্মের মানুষের সামনে আমাদের পরিচয় যেন আমাদের উন্নত চরিত্র ও আদর্শের মাধ্যমে ফুটে ওঠে, এ জন্য আমরা চেষ্টা করবো। পাশাপাশি মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করবো।

পূর্বের শ্রেণির ধারাবাহিকতায় এ শ্রেণিতে তুমি আরও কতিপয় আখলাকে হামিদাহ এবং আখলাকে যামিমাহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে। এবার তাহলে আখলাকে হামিদাহ'র বিষয়বস্তু দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করা যাক।

আখলাকে হামিদাহ (প্রশংসনীয় চরিত্র)

দানশীলতা

দানশীলতা একটি মহৎ গুণ। সমাজের দরিদ্র, অসহায় ও অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করাকে দানশীলতা বলা হয়। দানশীলতার প্রতিশব্দ বদান্যতা, উদারতা ও মহত্ত্ব ইত্যাদি। এটি মহান আল্লাহ ও মানুষের ভালোবাসা অর্জনের বিশেষ মাধ্যম। দানশীল ব্যক্তিকে সকলে ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধা করে।

সমাজে বিভিন্ন ধরনের মানুষ বসবাস করে। কেউ ধনী আবার কেউ গরিব। ধনীদের উচিত গরিবদের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। সমাজের গরিব লোকদের প্রতি দানশীলতা ও বদান্যতা প্রকাশ করা একটি মহৎ কাজ। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে এ ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘হে মু’মিনগণ ! আমি তোমাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি তা হতে সেদিন আসার পূর্বেই ব্যয় করো যেদিন কোনো ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ নেই। আর অবিশ্বাসীরাই অত্যাচারী।’ (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৪)

দান করা একটি ফযিলতপূর্ণ কাজ। দানশীল ব্যক্তিকে আল্লাহ তা‘আলা অফুরন্ত নেকি প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দানশীলতার ফযিলত বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন, ‘যারা আল্লাহর পথে স্বীয় সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্যবীজের ন্যায়; তা হতে উৎপন্ন হলো সাতটি শীষ, প্রত্যেকটি শীষে একশত শস্যদানা। আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা আরও বর্ধিত করে দেন, বস্তুত আল্লাহ হচ্ছেন প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।’ (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৬১)

দানশীলতা মানুষকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী এবং জান্নাতেরও নিকটবর্তী। জাহান্নামের আগুন থেকে দূরবর্তী। এ প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেন, ‘দানশীলতা জান্নাতের একটি বৃক্ষ। এর ডাল-পালা দুনিয়াতে ছড়িয়ে আছে। যে এর কোনো একটি ধারণ করবে তা তাকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। আর কৃপণতা জাহান্নামের একটি বৃক্ষ। কেউ এর কোনো ডাল ধারণ করলে তা তাকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দিবে।’ (বায়হাকী)

দানশীলতা মানুষের পাপ মোচন করে দেয়, মহান আল্লাহর ক্রোধকে মিটিয়ে দেয়। দান করলে বিপদ-আপদ দূর হয়। সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং পবিত্র হয়। মহান আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়া যায়। কেননা তিনি নিজেই দয়ালু ও দানশীল। তাইতো তিনি তাঁর সুন্দর নামসমূহের মধ্যে দয়ালু ও দাতা নাম দু’টি গ্রহণ করেছেন।

মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দানশীল হলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)। তাঁর দানের কোনো তুলনা করা সম্ভব নয়। তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠদাতা। তাঁর কাছে কেউ কিছু চেয়েছে আর তিনি জবাবে না বলেছেন, জীবনে এমনটি

কখনো হয়নি। তিনি এমন পরিমাণ দান করতেন যে, দানগ্রহণকারী বিস্মিত হয়ে যেত। কোন প্রার্থনাকারীকে দেওয়ার মত কিছু না থাকলে তিনি তাকে পরে দেওয়ার ওয়াদা করতেন এবং সে ওয়াদা তিনি পূর্ণ করতেন। কখনও কখনও তিনি অন্যের কাছ থেকে ঋণ নিয়েও দান করতেন।

মহানবি (সা.) এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সাহাবিগণও দানশীলতার সর্বোত্তম আদর্শ দেখিয়েছেন। তাঁরা মানুষের সহযোগিতায় সামর্থ্যের সবটুকু আল্লাহর রাস্তায় দান করেছেন। তাবূক অভিযানের সময় হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর সমুদয় সম্পদ দান করে দিয়েছিলেন। তাঁর দানে অভিভূত হয়ে মহানবি (সা.) বললেন, হে আবু বকর! তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য তুমি কী রেখে এসেছ? তিনি বললেন, তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে রেখে এসেছি। হযরত আবু বকরের দানশীলতার এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল।

দান করার জন্য আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। দান প্রকাশ্যে করা যায় আবার গোপনেও করা যায়। তবে গোপনে দান করা উত্তম। দানের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করার নিয়তে প্রকাশ্যে দান করা দোষের কিছু নয়।

কখনো কোনো সাহায্য প্রার্থনাকারীর সাথে খারাপ ব্যবহার করা উচিত নয়। কিছু দিতে না পারলেও তার সাথে হাসি মুখে কথা বলা উচিত। কেননা কারো সাথে হাসি মুখে কথা বলাও এক ধরনের সাদাকাহ। আবার দান করে খোঁটা দেওয়া যাবে না। এতে দানের ফযিলত নষ্ট হয়ে যায়।

আমরা দানশীলতার এই মহৎ গুণটি অর্জন করবো। সবসময় সাধ্যমতো দান করবো। দান করতে কখনও কার্পণ্য করবো না। সমাজ থেকে অভাব ও দারিদ্র্য দূর করতে ভূমিকা রাখবো।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে দানশীলতার ফযিলতগুলো আলোচনা করবে।

মিতব্যয়িতা

মিতব্যয়িতা মানবচরিত্রের একটি প্রশংসনীয় গুণ। মিতব্যয় মানবজীবনকে সমৃদ্ধ করে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নিরাপত্তা আনে।

মিতব্যয়িতা মানে ব্যয়ের ক্ষেত্রে সংযম ও সতর্কতা অবলম্বন করা। কিংবা 'আয় বুঝে ব্যয় করা'। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করাই হলো মিতব্যয়িতা। শুধু ব্যয়ের ক্ষেত্রে নয়; বরং কথাবার্তা, হাঁটা-চলায়ও ইসলামে মধ্যপন্থার নির্দেশ রয়েছে।

অপচয় ও কৃপণতা এই দুই প্রান্তিকতার মাঝখান হলো মিতব্যয়িতা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হওয়া

জরুরি। মিতব্যয়িতার মাধ্যমেই সফলতা অর্জন করা সম্ভব। তাই মানুষের জীনবযাত্রায় মিতব্যয়িতার গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রকৃত মুমিন ব্যক্তিরা খরচের ক্ষেত্রে অপচয়ও করেন না। আবার কৃপণতাও করেন না। তাঁরা নিজ প্রয়োজন মতো খরচ করেন। যাতে অন্যের কাছে হাত পাতা না লাগে। মিতব্যয়িতা মুমিন চরিত্রের অন্যতম গুণ।

মিতব্যয়ীকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন। সকল ধর্মে মিতব্যয়কে উৎসাহিত করা হয়েছে। কার্পণ্য ও অপব্যয়কে নিন্দা করা হয়েছে। মিতব্যয় মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি করে এবং অন্যকে সাহায্য করার পথ উন্মুক্ত করে।

একদিকে প্রতিবছর বিশ্বে কোটি কোটি টন খাদ্য অপচয় হয়। অন্যদিকে বিশ্বে প্রতিদিন অনেক মানুষ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটায়। আর এই সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন মিতব্যয়িতা। আবার আমরা যদি সব জায়গায় বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস প্রভৃতি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হই। তাহলে এসব ক্ষেত্রে অপচয় নিয়ন্ত্রণ হবে। ফলে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে।

মিতব্যয়িতার সঙ্গে সঞ্চয়ের একটি বড় সম্পর্ক রয়েছে। জাতীয় উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো সে দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধি। মিতব্যয়িতার মাধ্যমে সঞ্চয় করে সম্পদ বৃদ্ধি করা যায়। সঞ্চয় যত বৃদ্ধি পাবে, দেশের অর্থনীতি তত সমৃদ্ধ হবে। পরনির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে। দেশ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) মিতব্যয়িতার অভ্যাস তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কারণ মিতব্যয়ীকে আল্লাহ তা'আলা দারিদ্র্যমুক্ত জীবন দান করবেন। রাসুলে কারিম (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি পরিমিত ব্যয় করে সে নিঃস্ব হয় না'। (মুসনাদে আহমাদ)

মিতব্যয়িতার মাধ্যমে হালাল পন্থায় সঞ্চয় করে মানুষ অঢেল সম্পদের মালিক হতে পারে। ইসলাম এতে নিষেধ করে না; বরং সঞ্চিত অর্থ থাকলেই তো জনকল্যাণমূলক কাজ করা যায়। সদকায়ে জারিয়ার ধারা চালু করা যায়। আবার উদ্ধৃত অর্থ যখন নেসাব পরিমাণ হবে তখন যাকাতের মতো আরেকটি মহান ইবাদাতেরও সুযোগ মিলবে।

আমাদের প্রিয় নবি (সা.) ছিলেন মিতব্যয়িতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর ও পরিবারের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় করতেন। অতিরিক্ত সম্পদ তিনি দান করে দিতেন। আমরা মুমিন-মুত্তাকিদের জীবনী থেকেও মিতব্যয়িতার শিক্ষা পাই। মিতব্যয়ী ব্যক্তিকে সুসংবাদ দিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যাকে ইসলামের দিকে হেদায়েত করা হয়েছে, তার প্রয়োজন মাফিক জীবনোপকরণ আছে এবং সে তাতে সন্তুষ্ট রয়েছে'। (তিরমিযি)

মিতব্যয়িতা মানুষকে লোভ-লালসা, অপচয়, অপব্যয়, কৃপণতা, অলসতা ও আরামপ্রিয়তা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। তাই আমরা সবাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হব। তাহলে আমাদের জীবন হবে সুন্দর, সুখী ও সমৃদ্ধশালী।

একক কাজ/জোড়ায় কাজ

তুমি জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে এবং কীভাবে দানশীলতা ও মিতব্যয়িতা অবলম্বন করবে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

(শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তুমি একক/জোড়ায় দৈনন্দিন জীবনে দানশীলতা এবং মিতব্যয়িতার প্রয়োগক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে লিখে উপস্থাপন করো।)

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকার

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন এবং সম্মানজনক আচরণ করা মুমিনের জন্য অপরিহার্য। তাদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে অন্ধকে পথ ভুলিয়ে দেয় সে অভিশপ্ত'। (মুসনাদে আহমাদ)

'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' অনুসারে প্রতিবন্ধিতা অর্থ যেকোনো কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদি বা স্থায়ীভাবে কোনো ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা এবং উক্ত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার পারস্পরিক প্রভাব, যার কারণে উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হন।

প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে কুসংস্কার

প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে আমাদের সমাজে অনেক কুসংস্কার প্রচলিত। যেমন, প্রতিবন্ধী শিশু বাবা মায়ের পাপ বা অভিশাপের ফল, প্রতিবন্ধী শিশুর ওপর জিনের প্রভাব আছে, প্রতিবন্ধী শিশুর জন্মের জন্য বাবা-মায়ের অসচেতনতা দায়ী, মায়ের দোষে এমন শিশুর জন্ম হয়, প্রতিবন্ধী শিশু পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য অভিশাপ ইত্যাদি। আমাদের সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তার পরিবারকে উপহাস করা হয়। আল্লাহ তা'আলা এমন আচরণ নিষিদ্ধ করে বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى أَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ

وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى أَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ

অর্থ: 'হে মুমিনগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অপর কোনো নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।' (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১১)

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে অভিভাবকের অনেক ভাবনা। প্রতিবেশীরা কী বলবে, আত্মীয়স্বজনরা কী ভাববে? এসব ভেবে তাদেরকে কখনোই ঘরের বাইরে নেওয়া হয় না। তাদেরকে ঘরবন্দি করে রাখা হয়। প্রতিবন্ধী শিশুর

বিকাশ যাতে বাধাগ্রস্ত না হয়, সেজন্য এসব কুসংস্কার দূর করতে হবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মর্যাদা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা মর্যাদা ও সম্মানের দাবিদার। আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মর্যাদা অনেক বেশি। রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন। তিনি মদিনার বাইরে গেলে অন্ধ সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে (রা.) মদিনার অস্থায়ী শাসক নিয়োগ করতেন। অন্ধ ব্যক্তিদের জন্য জান্নাতের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি যে ব্যক্তির দু'টি প্রিয় চোখ কেড়ে নিয়েছি, অতঃপর সে ধৈর্য ধারণ করেছে। সে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে বলে মনে করে এবং সওয়াবের আশা করে, আমি তাকে জান্নাত ব্যতীত অন্য কোনো কিছু দিয়ে সন্তুষ্ট হব না'। (তিরমিযি)

ইসলাম প্রতিবন্ধী ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য শরিয়তের বিধিবিধান পালনে ছাড় দিয়েছে। প্রত্যেক ফরয বিধান তাদের সাধ্যের ওপর নির্ভর করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ؕ

অর্থ: 'আল্লাহ কারো ওপর এমন কোনো কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৮৬)

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার

প্রতিবন্ধীতা মানবজীবনের এক দুর্বিষহ অধ্যায়ের নাম। জন্মগত, দুর্ঘটনা কিংবা অসুস্থতা যে কারণেই হোক, ইসলাম সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করতেন। রাসুলুল্লাহকে (সা.) অনুসরণ করে মুসলিম খলিফারাও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। তারা সমাজের অসহায়-প্রতিবন্ধী লোকদের নামের তালিকা করেন। প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত পরিমাণ ভাতার ব্যবস্থা করেন। প্রতি দু'জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দেখভালের জন্য একজন খাদেম নিযুক্ত করেন। বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সেবাকেন্দ্র চালু করেন।

মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দায়িত্ব নেওয়া ফরযে কেফায়া। রাষ্ট্র যদি এ দায়িত্ব পালন না করে বা দেশের কোনো নাগরিকই তাদের সেবায় এগিয়ে না আসে, তাহলে সমাজের প্রতিটি মুসলমান এর জন্য দায়ী ও গুনাহগার হবে। পরকালে এ জন্য কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কারও দয়া চায় না। অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। দক্ষতা অর্জন করে স্বনির্ভর হতে চায়। আমাদের উচিত তাদের ব্যাপারে সমাজে বিদ্যমান নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে দেওয়া। ইসলাম তাদের যে সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে তা নিশ্চিত করা।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। আমরা প্রতিবন্ধীদের ভালোবাসব এবং তাদের যথাযথ সম্মান ও সহযোগিতা করব।

রোগীর সেবা

রোগীর সেবা বলতে বুঝায়, রোগীকে দেখতে যাওয়া, খোঁজ-খবর নেওয়া, প্রয়োজনীয় সেবা-শুশ্রূষা করা, সাহায্য করা, সাহস যোগানো, নরম ও সদয় কথা-বার্তা বলা ইত্যাদি।

রোগীর সেবা করা সুস্থ ব্যক্তির কর্তব্য এবং সেবা প্রাপ্তি রোগীর অধিকার। হাদিসের আলোকে এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের প্রতি যে ছয়টি দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে তার মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে তার সেবা করা অন্যতম।

অসুখ হলে অসুস্থ ব্যক্তি অসহায় হয়ে পড়েন। অনেক সময় তার জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়। নিজে চলাফেরা করতে পারেন না। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারেন না। এ সময় একজন রোগীর সেবা করার অর্থ প্রকৃতপক্ষে তার জীবন বাঁচাতে সাহায্য করা। একজন মানুষের জীবন বাঁচানোর চেয়ে উত্তম কাজ আর কিছুই হতে পারে না।

রোগীর সেবা করলে আল্লাহ তা'আলা খুশি হন। রোগীর সেবা করা মহান আল্লাহর সেবা করার শামিল। হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত হয়েছে, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে সম্বোধন করে বলবেন, 'হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমার সেবা করোনি।' বান্দা বলবে, 'আপনি তো সারা বিশ্বের পালনকর্তা। আমি আপনাকে কীভাবে সেবা করতে পারি?' আল্লাহ বলবেন, 'আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল। তুমি তার সেবা করলে সেটা আমারই সেবা করা হতো।' (মুসলিম)

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া মহানবি (সা.) এর আদর্শ। কেউ অসুস্থ হলে তিনি তাকে দেখতে যেতেন। রোগীর কপালে হাত রেখে স্নেহভরে খোঁজ-খবর নিতেন এবং তার আরোগ্যের জন্য দোয়া করতেন। জানতে চাইতেন, 'তোমার কি কিছু খেতে মনে চায়?' রোগী কোনো খাবারের কথা বললে তিনি দ্রুত তার ব্যবস্থা করতেন।

অমুসলিম কেউ অসুস্থ হলেও তিনি তাকে দেখতে যেতেন। একবার এক ইহুদি বালক অসুস্থ হয়ে পড়লো। মহানবি (সা.) তাকে দেখতে গেলেন। তার মাথার কাছে বসে অত্যন্ত মমতার সাথে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। বালকটি তখন ইসলাম গ্রহণ করলো। তখন মহানবি (সা.) বললেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি এই যুবককে জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন।' (বুখারি)

একবার মহানবি (সা.) এর প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হাসান (রা.) খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা.) তাঁকে দেখার জন্য আসলেন। তখন হযরত আলী (রা.) বললেন, 'কোনো মুসলিম সকালবেলা কোনো রোগীকে দেখতে গেলে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার সাথে রওয়ানা দেয়। প্রত্যেক ফেরেশতাই সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকে। তার জন্য জান্নাতে একটি বাগানও তৈরি করা হয়। আর সে যদি

সন্ধ্যাবেলা কোনো রোগীকে দেখতে বের হয়, তাহলে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার সাথে রওয়ানা দেয়। প্রত্যেক ফেরেশতাই সকাল পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকে এবং তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান বরাদ্দ করা হয়'। (আবু দাউদ)

তবে রোগী দেখতে গিয়ে বেশি সময় রোগীর কাছে অবস্থান করা উচিত নয়। এতে রোগী ক্লান্ত হয়ে যায়। তার পরিবারেরও কষ্ট হয়। তবে প্রয়োজন থাকলে বা রোগী কিংবা তার পরিবার আগ্রহী হলে দীর্ঘ সময় অবস্থান করাতে কোনো দোষ নেই। রোগীকে খুশি করতে বারবার দেখতে যাওয়া উত্তম। রোগীর গায়ে হাত রাখা এবং তার আরোগ্যের জন্য দু'আ করা সুন্নাত। রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন কোনো রোগী দেখতে যেতেন, তখন ডান হাত দিয়ে রোগীর কপাল স্পর্শ করতেন এবং বলতেন, 'হে মানুষের প্রভূ! রোগ-শোক দূর করুন, আরোগ্য দিন, আপনি আরোগ্যদাতা, আপনার আরোগ্য ছাড়া কোনো আরোগ্য নেই, যা কোনো রোগকে অবশিষ্ট রাখে না' (বুখারিও মুসলিম)। রোগীর সেবা করা ও তাকে দেখতে যাওয়ার সময় উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখা উচিত।

সুতরাং কেউ অসুস্থ হলে আমরা স্বেচ্ছায় তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবো। তার সেবা-শুশ্রূষা করবো। বিশেষ করে যারা অসহায়, অনাথ ও দরিদ্র, তাদের চিকিৎসার খোঁজ-খবর নিবো। তাদের পুষ্টিকর খাবার ও প্রয়োজনীয় ঔষধ দিয়ে সহায়তা করবো। আশাব্যঞ্জক কথা বলে তাদের মনকে প্রফুল্ল রাখবো। তাহলেই রোগীর প্রতি আমাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হবে।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

তুমি নিজ পরিবার/প্রতিবেশি কোন অসুস্থ ব্যক্তির সেবায় নিজেকে যেভাবে সম্পৃক্ত করেছো/ করতে পারো।

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তুমি একটি চেকলিস্ট পূরণ করে আনবে। এক্ষেত্রে, তুমি তোমার মা-বাবা, সহপাঠী বা শিক্ষকের সহায়তা নিতে পারো।)

ক্রমিক	কার্যক্রম	করেছি	করবো
১.	মা-বাবা অসুস্থ হলে তাদের সময় মতো ঔষধ সেবনের কথা মনে করিয়ে দেওয়া।	√	
২.	প্রতিবেশি/আত্মীয় অসুস্থ থাকলে/হলে তার খোঁজ খবর নেওয়া।		√
৩.			
৪.			
৫.			

নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন

নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন অন্যতম মহৎগুণ। মর্যাদার দিক থেকে নারী-পুরুষকে ইসলাম আলাদা করেনি। ইসলাম নারী জাতিকে যথাযথ অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছে। সম্মানের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন হলো নারী জাতির প্রতি উত্তম আচরণ করা, তার প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করা।

ইসলামে নারীর সম্মান ও মর্যাদা

নারীর মর্যাদা বলতে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নারীর যথার্থ মূল্যায়নকেই বুঝানো হয়। ইসলাম নারীকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে। কেননা ইসলাম পূর্ব যুগে নারী ছিল সবচেয়ে অবহেলিত, লাঞ্চিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত। সে সময় নারীদেরকে মানুষ হিসাবে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হতো না। তাদের সামাজিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। তাদের প্রতি খুবই কঠোর আচরণ করা হতো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কন্যা সন্তানকেও জীবন্ত কবর দিত। কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়া অমর্যাদার প্রতীক মনে করা হতো।

ইসলাম মা হিসেবে নারীকে সন্তানের কাছে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করেছে। একদিন জনৈক সাহাবি রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বললেন, অতঃপর কে? রাসুল (স.) বললেন, তোমার মা। সাহাবি বললেন, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবি বললেন, অতঃপর কে? তিনি বললেন, অতঃপর তোমার পিতা। (বুখারি) এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সন্তানের উপর পিতার চাইতেও মাতার অধিকার তিন গুণ বেশি। এটি মা হিসেবে নারীর অনন্য মর্যাদার পরিচায়ক।

কন্যা হিসেবেও নারীর মর্যাদা অপরিসীম। কন্যাদের ভালোভাবে প্রতিপালনের জন্য ইসলাম নির্দেশ প্রদান করেছে। মহানবি (সা.) বলেছেন, ‘মেয়ে শিশু বরকত (প্রাচুর্য) ও কল্যাণের প্রতীক’। হাদিসে আরও আছে, ‘যার তিনটি, দুটি বা একটি কন্যা সন্তান থাকবে; আর সে ব্যক্তি যদি তার কন্যা সন্তানকে সুশিক্ষিত ও সুপাত্রস্থ করে, তার জান্নাত নিশ্চিত হয়ে যায়’। (তিরমিযি)

ইসলাম স্ত্রী হিসেবে নারীকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছে। মহানবি (সা.) বলেছেন, ‘উত্তম স্ত্রী সৌভাগ্যের পরিচায়ক’। (মুসলিম) তিনি আরও বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম’। (তিরমিযি) স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা ও সম্মান স্বামীর অনুরূপ। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ‘নারীদের ওপর যেমন অধিকার রয়েছে পুরুষের, তেমনি রয়েছে পুরুষের ওপর নারীর অধিকার’। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২২৮)

অনেক পরিবারে মনে করা হয় পরিবারের ছেলেরা ‘বংশের বাতি’, তারা মা-বাবাকে রোজগার করে খাওয়াবে, দেখাশোনা করবে আর মেয়েরা তো চলে যাবে পরের বাড়ি! কাজেই খাওয়া-দাওয়া, লেখাপড়া সব ব্যাপারেই

সকলের মনোযোগ থাকে ছেলেদের প্রতি। ইসলাম এমন আচরণ করতে নিষেধ করেছে। মহানবি (সা.) ঘোষণা করেন, 'কোনো ব্যক্তির ঘরে কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে সে যদি তাকে জীবন্ত কবর না দেয়, তাকে (শিক্ষাসহ সব ক্ষেত্রে) অবজ্ঞা না করে এবং তার পুত্র সন্তানকে তার ওপর প্রাধান্য না দেয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন'। (আবু দাউদ)

নারীদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করা মুমিনের নিদর্শন। নারীর প্রতি সম্মানবোধ না থাকলে ইমান পূর্ণ হয় না। নারীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যায়। কুরআন ও হাদিসে এ ব্যাপারে মুমিনদেরকে নানা নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) স্ত্রীদের প্রতি ভালো ব্যবহারকারীদের উত্তম উম্মত হিসেবে বর্ণনা করে বলেন–

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ

অর্থ: 'তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম'। (তিরমিযি)

অন্য একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ মুমিন হবে। যে তাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও নিজ পরিবারের প্রতি অধিক সদয়'। (তিরমিযি)

ইসলাম নারীর মর্যাদার স্বীকৃতিস্বরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে মহর প্রদান অপরিহার্য করেছে। কিন্তু অনেক মুসলিম মহর আদায় করে না। আবার কেউ আংশিক আদায় করে। আবার কেউ যৌতুক গ্রহণ করে। যা ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই গর্হিত কাজ। মহর আদায়ের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ

অর্থ: 'আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪)

ইসলাম নারীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার দিয়ে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু আমাদের সমাজে নারীদেরকে তাদের উত্তরাধিকার বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে গড়িমসি করা হয়। কেউ আংশিক সম্পত্তি দেন। কেউ সামান্য কিছু টাকা পয়সা দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি লিখে নেয়। কেউ বাড়ি, গাড়ি, স্বর্ণ অলংকার, নগদ টাকা দিতে চায় না। মনে করে নারীরা অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হয় না। আবার কেউ সম্পূর্ণ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে। এটা নারীদের ওপর সবচেয়ে বড় যুলুম, যা ইসলাম কখনও সমর্থন করে না। ইসলাম নারী পুরুষকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার বানিয়েছে নির্দিষ্ট অংশের ভিত্তিতে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক অথবা বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ'। (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৭)

পূর্ণাঙ্গ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের জন্য নারীর প্রতি সম্মানবোধ থাকা আবশ্যক। অন্তর থেকে

নারীদের সম্মান করতে হবে। পাশাপাশি নিজ আচরণ ও কর্ম দ্বারাও এর প্রমাণ দিতে হবে। এতে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হবেন। তাহলে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারব।

দলগত কাজ

আমি আমার পরিবার, প্রতিবেশি, বিদ্যালয়ে নারীদের যে যে উপায়ে সম্মান প্রদর্শন করবো।

শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তুমি/তোমরা একটি তালিকা তৈরি করো।

যে ক্ষেত্রে সম্মান করবো	যাকে সম্মান করবো	যে উপায়ে সম্মান করতে পারি
পরিবার	মা, বোন	গৃহের কাজে সহায়তা করবো।
প্রতিবেশি		
বিদ্যালয়ে		

দেশপ্রেম

দেশ, মাটি ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা মানুষের সহজাত স্বভাব। সকল ধর্মের লোকই তাদের দেশকে ভালোবাসে। মা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি মানুষের এই ভালোবাসাকে ইসলাম কেবল সমর্থনই করে না; বরং একজন প্রকৃত মুমিনকে এগুলো ধারণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাসুলকেই স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছেন। মাতৃভূমি ও জন্মস্থানের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, মায়া-মমতা ও আকর্ষণই হলো দেশপ্রেম। এ ভালোবাসা মানুষের অন্তর থেকে আসে। আজীবন মানুষ এ আকর্ষণ ও ভালোবাসা অনুভব করে।

দেশপ্রেমের উপায়

দেশের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে। কারণ তিনিই আমাদেরকে স্বাধীন ও সার্বভৌম ভূখণ্ড দান করেছেন। যাঁরা স্বাধীনতা অর্জনে ত্যাগ ও অবদান রেখেছেন, তাঁদের প্রতি সম্মান জানানো, তাদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করা এবং তাঁদের জন্য দোয়া করা আমাদের কর্তব্য।

নাগরিকের প্রধান দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রের সংবিধান, প্রচলিত আইন ও বিধি মেনে চলা, নিয়মিত 'কর' পরিশোধ করা এবং তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা। এছাড়াও ভিন্নমতকে শ্রদ্ধা করা, নিজস্ব কৃষ্টি ও মূল্যবোধ চর্চা করা, রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার মাধ্যমে দেশপ্রেমিক হওয়া, সন্ত্রাস, হানাহানি, মারামারি ও বিশৃঙ্খলা না করা দেশপ্রেমের অংশ।

একজন প্রকৃত মুমিন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক হয়ে থাকেন। তাই ইসলামের আলোকে দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ

মানুষকে স্বদেশ রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে। কারণ স্বদেশকে হেফাযত করতে না পারলে ধর্মকে হেফাযত করা যায় না। দেশের মানুষ ও তাদের স্বার্থকে সংরক্ষণ করা যায় না।

দেশের জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রতিবেশ রক্ষা করা একজন দেশপ্রেমিক নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কিয়ামত হয়ে যাবে এটা যদি আগেভাগে অনুমান করতে পারো, তাহলেও হাতে রক্ষিত গাছের চারা রোপণ করে দাও।'(আদাবুল মুফরাদ)

জনস্বার্থ বিরোধী কাজ হলো দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, খাদ্যে ভেজাল, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, খাদ্যে ক্ষতিকর কেমিক্যাল মিশানো ইত্যাদি। দেশপ্রেমিক নাগরিক এসব কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং এসব কাজ প্রতিরোধে সচেষ্ট থাকবে।

দেশপ্রেমের গুরুত্ব

মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা ইসলামি মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কোনো দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে না পারলে মান-সম্মান, স্বাধিকার, ইমান ও আমল হেফাযত করা অসম্ভব। এজন্য ধর্মীয় দৃষ্টিতে দেশপ্রেমের গুরুত্ব অত্যধিক।

মক্কা থেকে বিদায়ের সময় রাসুল (সা.) বলেছিলেন, 'ভূখণ্ড হিসেবে তুমি কতই না উত্তম, আমার কাছে তুমি কতই না প্রিয়। যদি আমার স্বজাতি আমাকে বের করে না দিত, তবে কিছুতেই আমি অন্যত্র বসবাস করতাম না' (তিরমিযি)। হিজরত করে মদিনায় গমন করার পর রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রায়ই মক্কায় ফিরে যেতে ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'যিনি আপনার জন্য কুরআনকে জীবনবিধান বানিয়েছেন, তিনি আপনাকে অবশ্যই আপনার জন্মভূমিতে ফিরিয়ে আনবেন।' (সূরা কাসাস, আয়াত: ৮৫)

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) স্বদেশকে ভালোবাসতেন। হিজরত করে মদিনায় যাওয়ার পর আবু বকর (রা.) ও বেলাল (রা.) জ্বরে আক্রান্ত হলেন। তখন তাদের মনেপ্রাণে মক্কার স্মৃতিগুলো ভেসে উঠেছিল। সে সময় তারা মক্কার দৃশ্যাবলি স্মরণ করে কবিতা আবৃত্তি শুরু করলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের মনের এ অবস্থা দেখে প্রাণভরে দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ! আমরা মক্কাকে যেমন ভালোবাসি, তেমনি তার চেয়ে বেশি মদিনার ভালোবাসা আমাদের অন্তরে দান কর'।

জীবনে সফলতা অর্জন প্রত্যেকেরই লক্ষ্য থাকে। দেশপ্রেম সফলতা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। মাতৃভূমি মানুষের জন্য শান্তির আশ্রয়। মাতৃভূমির পরশে যে প্রশান্তি খুঁজে পাওয়া যায় তা অনন্য। কোনো সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে উহুদ পাহাড় চোখে পড়লে নবিজি (সা.)-এর চেহারায় আনন্দের আভা ফুটে উঠতো। তিনি বলতেন, 'এই উহুদ পাহাড় আমাদের ভালোবাসে, আমরাও উহুদ পাহাড়কে ভালোবাসি।' (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং আমরা দেশকে ভালোবাসবো। ঐক্যবদ্ধ থেকে দেশের কল্যাণে অবদান রাখবো।

শালীনতা

শালীনতার শাব্দিক অর্থ মার্জিতকরণ, সংশোধন করা, পরিশোধন, লজ্জাশীলতা, বিনম্রতা, ভদ্রতা, বেশ-ভূষা,কথাবার্তা ও আচার-আচরণে মার্জিত হওয়া। যে আচার আচরণ, কথা বার্তা, চলাফেরা ও পোশাক-পরিচ্ছদে ভদ্র, সভ্য, বিনম্র মার্জিত ও সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায় তাকে শালীনতা বলা হয়। শালীনতা একক কোনো গুণের নাম নয়। এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। অনেক গুণের সম্মিলিত রূপ শালীনতা। অশ্লীলতা, লজ্জাহীনতা, উগ্রতা, অহংকার কদর্যতা ইত্যাদি শালীনতার বিপরীত।

শালীনতার গুরুত্ব

শালীনতা ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার মূলভিত্তি। একটি সুন্দর সমাজ গঠনে শালীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই ইসলাম মানুষকে মার্জিত, রুচিশীল, নম্র-ভদ্র ও শালীন হওয়ার শিক্ষা দেয়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ আমাদের শালীনতার শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত লোকমান তাঁর পুত্রকে শালীনতার যে উপদেশ দিয়েছিলেন পবিত্র কুরআনে তা উল্লেখ আছে। তিনি বলেছিলেন, 'অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না। পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে চলো না, কারণ আল্লাহ কোনো উদ্ধত-অহঙ্কারী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না।' (সূরা লুকমান, আয়াত: ১৮)

মানুষের মধ্যকার সকল প্রকার পাশবিকতা ও কুপ্রবৃত্তিকে অবদমিত করার জন্য শালীনতা একান্ত অপরিহার্য। কেননা অশালীন আচার-আচরণ ও বেশ-ভুষা মানুষের মধ্যকার সুপ্ত কুপ্রবৃত্তিসমূহকে জাগিয়ে তোলে। তখন মানুষ যে কোনো অসৎ ও অন্যায় কাজ করতে দ্বিধা করে না। শালীনতার চর্চার মাধ্যমেই এসব অন্যায় থেকে বিরত থাকা সম্ভব।

শালীনতা মানুষকে পাপাচার থেকে পূতঃপবিত্র রাখে। কেননা অশালীনতা, অশ্লীলতা ও লজ্জাহীনতা সমাজে পাপের দুয়ার খুলে দেয়। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাবে শালীনতা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। নারী পুরুষের দৃষ্টি সংযত রাখতে বলেছেন।

শালীনতার অন্যতম দিক হলো লজ্জাশীলতা। লজ্জাশীলতা মানুষকে শালীন হতে সাহায্য করে। মহানবি (স.) বলেন 'তোমার যদি লজ্জাই না থাকে তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারো'। (বুখারি) তিনি আরও বলেন,

اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ

অর্থ: 'লজ্জাশীলতার পুরোটাই কল্যাণময়'। (মুসলিম)

লজ্জাশীলতা ঈমানেরও অঙ্গ। তাই একজন মুমিন অবশ্যই ভদ্র, লজ্জাশীল ও মার্জিত হবেন। যেমন মহানবি (স.) বলেন–

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ

অর্থ: ‘লজ্জাশীলতা ইমানের একটি শাখা।’ (নাসাঈ)

কারো আচার-আচরণ মার্জিত হলে সবাই তাকে ভালোবাসে। অন্যদিকে কারো আচরণ, কথাবার্তা অথবা পোশাক-পরিচ্ছদ অশালীন হলে কেউই তাকে ভালোবাসে না। সবাই তাকে খারাপ মনে করে। এজন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,‘অশ্লীলতা যেকোনো জিনিসকে খারাপ করে এবং লজ্জাশীলতা যেকোনো জিনিসকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে।’ (তিরমিযি)

শালীনতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মার্জিত ও রুচিশীল পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা। শালীনতার জন্য শালীন পোশাক অপরিহার্য। শালীনতাপূর্ণ জীবনাচারণে সমাজ উন্নত হয়। পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে অশোভন আচরণ মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তৈরি করে, নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় ঘটায়। অশালীন ব্যক্তিকে কেউ পছন্দ করে না। মহানবি (সা.) বলেন, ‘মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যার অশ্লীলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করে।’ (বুখারি) এমন মানুষকে আল্লাহ তা‘আলাও পছন্দ করেন না। হাদিসে এসেছে, ‘নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা‘আলা অশালীন ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন।(তিরমিযি)

সুতরাং আমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শালীনতার চর্চা করবো। কথা-বার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার কোনো কিছুতেই যেন উগ্রতা, অশ্লীলতা, অশালীনতা প্রকাশ না পায় সেদিকে খেয়াল রাখবো। তাহলেই আমাদের জীবন সুন্দর ও সার্থক হবে। সকলে আমাদের ভালোবাসবে। আর সমাজেও সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করবে।

প্যানেল আলোচনা

‘কুরআন-হাদিসের আলোকে দেশপ্রেম চর্চা করি, সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ি’

‘শালীনতা জেনে/বুঝে নেই, নিজেকে আধুনিক করি’

(শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তোমরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে আলোচনা করে উপস্থাপন করো।)

আখলাকে যামিমাহ (নিন্দনীয় চরিত্র)

ঘৃণা

ঘৃণা অর্থ কাউকে অত্যধিক অপছন্দ করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, হীন ও নীচ মনে করা। ঘৃণার আরবি প্রতিশব্দ আল বুগদু (البغض), এর বিপরীত শব্দ الحب বা ভালোবাসা। অহংকার বশত নিজেকে বড় মনে করে অন্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা ও তার সাথে দূরত্ব বজায় রাখাই হলো ঘৃণা। কাউকে ঘৃণা করলে, তার কোনো কিছুই সহ্য হয় না। উভয়ের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি হয়।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে মর্যাদাবান করে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আমাদের সমাজের অনেকেই মানুষকে পেশাগত কারণে ও অর্থবিত্তের কারণে সম্মান করে বা ঘৃণা করে। আমাদের আশেপাশে লক্ষ করলেই দেখতে পাবো, অনেকে কথা-বার্তায় ও আচার-আচরণে অন্যের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে। যেমন, অনেকে জুতো সেলাইকারী, রিক্সাচালক, ভ্যানগাড়ি চালক, পরিচ্ছন্নতা কর্মীকে অবজ্ঞা করে কথা বলে তাদেরকে উপেক্ষা করে, তারা নিকটাত্মীয় হওয়ার পরও শুধু দরিদ্র হওয়ার কারণে তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে না।

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ঘৃণা ও ঘৃণা প্রকাশক কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকতে আদেশ দিয়ে বলেন, 'হে মুমিনগণ! কোনো সম্প্রদায় যেন অপর সম্প্রদায়কে উপহাস না করে। কেননা, তারা উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। কোনো নারী যেন অন্য নারীকে বিদ্রুপ না করে। সে বিদ্রুপকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না ও একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না' (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১১)। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় পদ-পদবি, সামাজিক পদমর্যাদাও হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়। তাই এসব কারণে কাউকে ঘৃণা করা উচিত নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কাউকে ঘৃণা করলে, পরবর্তীকালে লজ্জা পেতে হয়। চাই সে ঘৃণিত ব্যক্তি ঘৃণাকারীকে লজ্জা দিক বা ঘৃণাকারী নিজে ঘৃণিত ব্যক্তির উন্নতি দেখে লজ্জা পাক।

সমাজে ঘৃণার প্রভাব ও পরিণতি

পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ সমাজের একটি ভীষণ নিন্দনীয় দিক। ঘৃণার কারণে সমাজে বিভেদ তৈরি হয়, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। বেশিরভাগ সময় অহংকারবশত মানুষ অন্যকে ঘৃণা করে। অহংকারী মানুষ নিজেকে বড় মনে করে অন্যকে হেয় করে কথা-বার্তা বলে, তাকে অপমান-অপদস্থ করে। এভাবেই সমাজে ঘৃণার প্রসার ঘটে। মানুষ যাতে নিজের উঁচু পদ-পদবি, অর্থ-বিত্ত, সামাজিক পদমর্যাদার কারণে অহংকার না করে, সে জন্য আল্লাহ তা'আলা কুর'আন মাজিদে মানুষকে তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি?' (সূরা মুরসালাত, আয়াত: ২০)।

ঘৃণার প্রসার ঘৃণাকারী ও ঘৃণিত উভয়কে কষ্ট দেয়। যাকে ঘৃণা করা হয় তিনি লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করেন। অন্যদিকে ঘৃণাকারী অন্যকে ঘৃণা করার কারণে মানসিক অস্থিরতায় ভোগে। তার অন্তরের প্রশান্তি দূর হয়ে যায়। ঘৃণা কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না বরং সৎকর্মকে ধ্বংস করে দেয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের রোগ তোমাদের মাঝে সংক্রমিত হয়েছে। তা হলো হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা। আর ঘৃণা (সৎকর্ম) ধ্বংস করে দেয়।' (তিরমিযি)

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন–

لَا تَبَاغَضُوْا ، وَلَا تَحَاسَدُوْا ، وَلَا تَدَابَرُوْا ، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا ،
وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

অর্থ: 'তোমরা পরস্পরকে ঘৃণা করো না, হিংসা করো না, ষড়যন্ত্র করো না। তোমরা পরস্পর আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাও। কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, সে তাঁর ভাইয়ের সাথে তিন রাতের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকবে।' (বুখারি)

ইবলিস শয়তান অহংকারবশত হযরত আদম (আ.) এর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। শয়তানের প্ররোচনায় আমরা অন্যকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করি। আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করব যেন, আমরা কাউকে অন্যায়ভাবে ঘৃণা না করি। কখনো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কারো প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করলে, তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিব।

আমাদের ভালোবাসা ও ঘৃণা হবে আল্লাহর জন্য। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'যে আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসে, আর আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা করে এবং আল্লাহর জন্যই দান-সদাকা করে আবার আল্লাহর জন্যই দান-সদাকা করা থেকে বিরত থাকে তাঁর ঈমান পরিপূর্ণ হলো' (আবু দাউদ)। আমরা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ মানুষকে ভালোবাসবো, তাদের সাথে ওঠাবসা করবো। যারা পাপ কাজ করে ও পাপ কাজের প্রসারে সাহায্য করে, তাদের থেকে দূরে থাকবো।

যুলুম

যুলুম আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো নির্যাতন বা অত্যাচার। সাধারণ অর্থে যার যা প্রাপ্য তাকে সেই প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার নাম যুলুম। সে হিসেবে কারো অধিকার হরণ, অশ্লীল ভাষায় গালাগাল, বিনা অপরাধে নির্যাতন, অন্যায়ভাবে কারো আর্থিক, দৈহিক, মানসিক ও মর্যাদার ক্ষতিসাধন, মানহানিকর অপবাদ দেওয়া, দুর্বলের ওপর নৃশংসতা চালানো, অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ হরণ, উৎপীড়ন বা যন্ত্রণা প্রদান করা, কারো প্রতি ন্যায়বিচার না করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা ইত্যাদি সবই যুলুমের পর্যায়ভুক্ত।

আর যে যুলুম করে, তাকে বলা হয় জালিম।

ইসলামে যুলুম কঠোরভাবে হারাম করা হয়েছে। যুলুমকারী সবচেয়ে ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট ব্যক্তি। হাদিসে কুদসিতে মহানবি (সা.) ঘোষণা করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে আমার বান্দারা! আমি আমার নিজের জন্য যুলুম করা হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যেও যুলুম হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা একজন অন্যজনের উপর যুলুম করো না।' (মুসলিম)

যুলুম একটি সামাজিক ব্যাধি। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র ব্যাপক আকার ধারণ করেছে এটি। অন্যের ওপর অন্যায় বা অবিচার করে জালিমরা নিজের পতন ও ধ্বংস ডেকে আনে। যুলুমের কারণে পুরো পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। শান্তি ও সম্প্রীতি বিনষ্ট হচ্ছে। ফলে এক সময় জালিম বা অন্যায়কারীর জীবনে নেমে আসে নানা বিপদ-আপদ। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই যারা মানুষকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাদের শাস্তি প্রদান করবেন' (মুসলিম)। আর এ শাস্তি শুধু মুসলমান নয়, কোনো অমুসলিমের ওপর যুলুম করলেও প্রযোজ্য।

মাজলুম বা নিপীড়িতের দোয়া কখনো ব্যর্থ হয় না। তাই মাজলুমের চোখের পানি ও অন্তরের অভিশাপ জালিমের পতনের কারণ হয়। মাজলুমের আর্তনাদের ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে জালিমদের ওপর নেমে আসে কঠিন শাস্তি। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'তিন ব্যক্তির দোয়া আল্লাহর কাছ থেকে ফেরত আসে না। এক. ইফতারের সময় সিয়ামপালনকারীর দোয়া। দুই. ন্যায়পরায়ণ শাসকের দোয়া। তিন. মাজলুমের দোয়া।' (তিরমিযি)

আমাদের প্রিয় নবি (সা.) জালিমকে তার যুলুম থেকে প্রতিহত করার ব্যাপারে কঠোর তাগিদ দিয়ে বলেন, 'মানুষ যদি কোনো অত্যাচারীকে অত্যাচারে লিপ্ত দেখেও তার দু'হাত চেপে ধরে তাকে প্রতিহত না করে, তবে আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই তাদের সবাইকে তাঁর ব্যাপক শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত করবেন।' (তিরমিযি)। যুলুমকারী বড় হতভাগা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা কি জানো গরিব কে? সাহাবিগণ বললেন, আমাদের মধ্যে যার সম্পদ নেই সে হলো গরিব লোক। তখন তিনি বললেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে সে হলো গরিব, যে কিয়ামতের দিন সালাত, সাওম ও যাকাত নিয়ে আসবে অথচ সে অমুককে গালি দিয়েছে, অপবাদ দিয়েছে, অন্যায়ভাবে লোকের সম্পদ খেয়েছে, রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে প্রহার করেছে। কাজেই এসব নির্যাতিত ব্যক্তিকে সেদিন তার নেক আমল দিয়ে দেওয়া হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' (মুসলিম)

আমাদের উচিত যুলুম থেকে দূরে থাকা। কেননা জালিম যুলুম করে ঘুমিয়ে থাকলেও মাজলুম বা নির্যাতিত ব্যক্তি জেগে থাকে। সে জালিমের প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকে। নিশ্চয়ই মাজলুমের বদদোয়ায় জালিমের জন্য ভয়াবহ পরিণতি রয়েছে। যুলুম থেকে দূরে থাকার কার্যকর উপায় হচ্ছে ক্ষমতার লোভ, লালসা, হিংসা, ধর্মীয় বিদ্বেষ, ক্রোধ থেকে আত্মসংবরণ করা, জনসেবা, ধর্মীয় সেবা, পরোপকারমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করা, বৈধ পন্থায় উপার্জিত অর্থে পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদে সন্তুষ্ট থাকা।

যুলুমের বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সব ধরনের যুলুম থেকে বিরত থাকা। সেই সাথে যুলুমের সহযোগিতা করা থেকে বেঁচে থাকা।

চুরি

অন্যের সম্পদ বা টাকা-পয়সা গোপনে নিজের হস্তগত করাকে আমরা চুরি বলি। চোরের পেশা বা কাজই চুরি করা।

চুরির কারণ

সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধির ফলে যখন অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয় তখনই অভাবি-সুবিধা বঞ্চিত মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় চুরি করে। অনেকে আবার লোভের বশবর্তী হয়ে চুরি করে। অনেক সময় সংঘবদ্ধ চক্র দরিদ্র ব্যক্তিদের আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে চুরি করতে বাধ্য করে।

চুরির পরিণাম

চুরি একটি জঘন্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ। চুরির কারণে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নানা দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। হঠাৎ করে সম্পদ হারিয়ে, সম্পদের মালিক নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। চোরের কারণে সবাই নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। শান্তিতে ঘুমাতে পারে না। সম্পদ হারনোর দুশ্চিন্তায় সবার মানসিক প্রশান্তি নষ্ট হয়ে যায়।

চোর চুরি করতে গেলে তার অপরাধ চুরির মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না। সে অন্যান্য অপরাধে জড়িয়ে যায়। এছাড়া অপরাধীদের চক্রের সাথে তার সখ্য গড়ে ওঠে। চুরির পাশাপাশি, ডাকাতি, ছিনতাই, চোরাকারবার, অপহরণ, পাচার, মাদকাসক্তিসহ নানা অপরাধে জড়িয়ে যায়।

সবাই চোরকে ঘৃণা করে। তার সাথে সম্পর্ক রাখে না। চোরের পরিবারের সদস্যরাও অপমানিত ও ঘৃণিত জীবন যাপন করে। নিকটাত্মীয় হলেও তার সাথে আত্মীয়তার পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে। দুনিয়া ও আখিরাতে চোরকে কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়। কোনো মুমিন ব্যক্তি কখনো অন্যের সম্পদ চুরি করতে পারে না। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ‘চোর যখন চুরি করে তখন সে ঈমানদার থাকে না’। (বুখারি)

চুরি করা হারাম। কোনো ব্যক্তি চুরি করাকে হালাল মনে করলে সে কাফির হয়ে যাবে।

চুরির প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা

১. ইসলামি অনুশাসন মেনে চলা

প্রত্যেক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও সম্মানে হস্তক্ষেপ করা নিষেধ। আমরা কখনো অন্যের কোনো বস্তু ছোটো হোক বা বড় হোক, না বলে নিব না। কারণ ছোটো কিছু একবার চুরি করলে শয়তান অন্য কিছু চুরি করতে প্ররোচিত করে। আমরা যা কিছু করি আল্লাহ সবকিছু জানেন, এই বিশ্বাস চর্চা করতে হবে।

২. সমাজে সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা

ইসলাম দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদেরকে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছে। বেকার মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। আশ্রয়হীন মানুষদের পুনর্বাসন করার চেষ্টা করতে হবে। কোনো এলাকায় অর্থনৈতিক সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে চুরির মতো অপরাধ হ্রাস পায়।

৩. সচেতনতা বৃদ্ধি

অনেক সময় আমাদের সম্পদ যথাযথ সংরক্ষণ না করার ফলে চোর চুরি করে। আমাদের উচিত নিজের মালিকানাধীন সম্পদ যথাযথ সংরক্ষণ করা। সামর্থ্য থাকলে আমরা চুরি প্রতিরোধ করার জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা নিতে পারি। ইসলামে চুরির মাল ক্রয় নিষিদ্ধ। তাই কখনো যদি সন্দেহ হয় যে এটি চুরি করা দ্রব্য তাহলে আমরা সেটি ক্রয় করা থেকে বিরত থাকবো।

৪. দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি

ক্ষুধার যন্ত্রণা না থাকলে, অভ্যাসগতভাবে কেউ চুরি করলে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। একজন শাস্তি পেলে অন্যরা শাস্তির ভয়ে চুরি করা থেকে বিরত থাকবে।আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ
وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

অর্থ : 'পুরুষ চোর আর নারী চোর, তাদের হাত কেটে দাও। এটি তাদের কৃতকর্মের ফল, আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ৩৮)

তবে মনে রাখতে হবে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া যাবে না। চোরকে অনেক সময় গণপিটুনি দেওয়া হয় যেটা ইসলামে নিষিদ্ধ। কারণ এভাবে অনেক সময় নিরপরাধ মানুষ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে শাস্তি পায়। গণপিটুনিতে অনেকের মৃত্যু হয়ে যায়। বিচারক সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে শাস্তি দিবেন।

তবে কোনো অবস্থাতেই প্রমাণিত অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত রাখা জায়েয হবে না। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, 'মাখযূম গোত্রের এক নারী চুরি করলে, মহানবি (সা.)-এর প্রিয় পালকপুত্র উসামা বিন যায়িদ (রা.) মহানবি (সা.) এর সাথে তার ব্যাপারে কথা বললেন। মহানবি (সা.) উসামা (রা.)-কে বললেন, 'তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘনকারিণীর শাস্তি মওকুফের সুপারিশ করছ?' অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) দাঁড়িয়ে খুতবায় বললেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে এ কাজই ধ্বংস করেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো সম্মানিত লোক চুরি করত, তখন তারা তাকে বিনা সাজায় ছেড়ে দিত। অন্যদিকে যখন কোনো দুর্বল লোক চুরি করত, তখন তার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মাদ (সা.) এর কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তাহলে আমি অবশ্যই তাঁর হাত কেটে দিতাম।' (বুখারি)

ইসলাম অর্থনৈতিক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বারোপ করেছে, যাতে অভাবের তাড়নায় কেউ চুরি না করে। উমর (রা.) রাতের আঁধারে ছদ্মবেশে নাগরিকদের খোঁজখবর নিতেন, প্রয়োজনে তাদের ঘরে খাবার পৌঁছে দিতেন। একইভাবে ক্ষুধার তাড়নায় কেউ চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে না। কোনো এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও চুরির শাস্তি হিসাবে হাত কাটা যাবে না। কারণ তখন এমন অনেকেই চুরি করতে পারে, যে আসলে স্বভাবগতভাবে চোর নয়। আমাদের উচিৎ নিজে সচেতন হওয়া অন্যকে সচেতন করা।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

'আখলাকে যামিমাহ বর্জন করে আমি নিজেকে পরিশুদ্ধ রাখি'

উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তুমি তোমার দৈনন্দিন জীবনে (পরিবার, বিদ্যালয়) আখলাকে যামিমাহ থেকে কীভাবে নিজেকে দূরে রাখো/রাখবে তা প্রতিফলন ডায়েরিতে লিখে আনবে। এক্ষেত্রে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য, সহপাঠী, শিক্ষকের সহায়তা নিতে পারো।

মিথ্যা শপথ করা

প্রিয় শিক্ষার্থী! তোমরা দেখে থাকবে তোমাদের কতিপয় বন্ধুরা কথায় কথায় শপথ করে বলে আল্লাহর কসম আমি এটা করিনি, ওটা করিনি। এ রকম শপথ যদি মিথ্যা হয় তাহলে তা মারাত্মক গুণাহের কাজ। তাহলে এর মাধ্যমে মূলত আল্লাহকে সামনে রেখে মিথ্যা বলা হলো।

আবার দেখবে অনেকে বিদ্যার শপথ করে, মায়ের শপথ করে। এগুলোও চরম অন্যায়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা যাবে না। দেখা যায় অনেকেই কুরআন ছুঁয়ে, মাথা ছুঁয়ে বা কারো নামে শপথ করে। ইসলামি বিধান মতে এগুলো শিরক ও সবচেয়ে বড় গুনাহ। মহানবি (সা.) বলেন,

مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُوْنَ اللّٰهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

অর্থ: 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করে, সে অবশ্যই শিরক করল।' (তিরমিযি)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করার মাধ্যমে কোনো মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করে, সে নিজের জন্য জাহান্নাম অবধারিত ও জান্নাত হারাম করে ফেলে।' এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল! যদি তা নগণ্য জিনিস হয় তবুও?' তিনি বললেন, 'যদি একটা গাছের ডালও হয় তবুও।' (মুসলিম)

ইসলামে মিথ্যা শপথ করা বা কসম করে মানুষকে ধোঁকা দেওয়া কবিরা গুনাহ বা বড় পাপের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, 'কবিরা গুনাহগুলো হচ্ছে, আল্লাহ

তা'আলার সাথে কাউকে শরিক করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা শপথ করা।' (বুখারি)

বাজারে অনেক দোকানদার পণ্য বিক্রয়ের জন্য শপথ করে বলে আল্লাহর কসম বিশ্বাস করেন এটা আমার এত দামে কেনা। এক্ষেত্রে যদি মিথ্যা শপথ করে অর্থাৎ পণ্যের দাম বাড়িয়ে শপথ করে বলে তবে কিয়ামতের দিন তার ভয়াবহ পরিস্থিতি হবে।

মানুষকে ঠকানোর জন্য যে শপথ করা হয়, তার পরিণাম ভয়াবহ। এমনকি হাদিস অনুযায়ী সে সব শপথকারীর জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায় এবং জান্নাত হারাম করে দেওয়া হয়। সে হিসেবে সরকারি-বেসরকারি বড় পদ পেয়ে যারা শপথ পাঠ করেন, তাদেরকে সবসময় সাবধান থাকা খুব জরুরি, যাতে শপথের বিপরীত কিছু না হয়ে যায়। রাসুল (সা.) বলেন, 'কেউ (মিথ্যা) শপথের মাধ্যমে কোনো মুসলিমের অধিকার হরণ করলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করে দেন এবং তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন।' (মুসলিম)

আমাদের উচিত মিথ্যা শপথ করা থেকে বেঁচে থাকা। স্মরণ রাখতে হবে, অহেতুক শপথ করা ইসলাম সমর্থন করে না। আর মিথ্যা শপথ করাতো ইসলামে আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। সত্য বিষয়ে দৃঢ়তা প্রকাশের জন্য আল্লাহর নামে শপথ করা যেতে পারে।

অলসতা

প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা নিশ্চয়ই এই বিখ্যাত উক্তিটি শুনেছ- 'পরিশ্রমে ধন আনে পূণ্যে আনে সুখ, অলসতায় দরিদ্রতা পাপে আনে দুঃখ'।

অলসতা মানব চরিত্রের একটি নেতিবাচক দিক। অলসতা মানে কর্মবিমুখতা। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের আড্ডাখানা। অলস ব্যক্তি কর্মবিমুখ থাকে। নিষ্ক্রিয়, কর্মবিমুখ কিংবা উদ্যমহীন ব্যক্তিকে অলস বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি। পরিশ্রমী ব্যক্তি জীবনে সফল হয়। মানুষ তাই পায়, যার জন্য সে প্রচেষ্টা চালায়। অপরদিকে অলস ব্যক্তি জীবনে পরিবর্তন লাভ করতে পারে না। অলস ব্যক্তিদের দুইটি পন্থা-একটি হলো এটি পারবো না, অপরটি হলো ওটি দরকার নেই। যারা অলস, তাদের দিনশেষে অনেক ভোগান্তিও ভোগ করতে হয়।

অলসতা মুনাফিকদের আচরণ। মুনাফিকরা যখন সালাতে দণ্ডায়মান হয় তখন অলসতা করে। সময়মত সালাত আদায় করে না। সালাতের আরকান আহকাম ঠিকমত পালন করে না। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'তাদের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ করা হয়েছে এইজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অস্বীকার করে, সালাতে শৈথিল্যের সাথে উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থ সাহায্য করে।' (সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ৫৪)'

আলসেমি নিজের ও সমাজের অবক্ষয় ডেকে আনে। অলসতা একটি জাতির উন্নতির পথে হুমকিস্বরূপ। অলসতা

মানুষের শিরাগুলো এমন ভাবে খেয়ে ফেলে যেভাবে লোহাকে মরিচা খেয়ে নেয়। চিকিৎসা শাস্ত্রমতে অলসতা কোষ্ঠকাঠিন্যের একটি বড় কারণ। ফুসফুসে নিয়মিত কর্মব্যস্ততা না থাকলে তা দুর্বল হয়ে পড়ে। অলস ব্যক্তি সহজেই দম হারিয়ে ফেলে। নিজেকে অলস বানিয়ে রাখলে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়াও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়তে শুরু করে।

অলসতা মানে নিস্ক্রিয় থাকা, কাজ থেকে দূরে পালিয়ে বেড়ানো। এভাবে কাজ ফেলে রেখে দিলে পরবর্তীকালে অল্প সময়ে অনেক কাজ একসাথে করতে হয়। এতে কোনো কাজেরই গুণগতমান ভালো হয় না। আবার অনেক কাজই শেষ পর্যন্ত করা হয়েই উঠে না।

যে ব্যক্তি অলসতায় আচ্ছন্ন, সে কাজের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারে না। বড় কোনো কিছু অর্জন করতে গেলে ছোট ছোট লক্ষ্য অর্জন করেই সামনে এগিয়ে যেতে হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নিজেকে ভালোবাসা, নিজের কাজকে ভালোবাসা, নিজের অলসতা দূর করার জন্য নিজেই নিজেকে অনুপ্রাণিত করা।

অলসতা কাটানোর আরেকটি শক্তিশালী উপায় হলো, সফল ব্যক্তিদের জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া। পৃথিবীর সফল মানুষগুলো তাদের জীবনে কঠোর পরিশ্রম করেই সফল হয়েছেন। তাই অলসতা দূর করার জন্য সফল ব্যক্তিদের জীবন কাহিনী পড়তে হবে, জানতে হবে। তাদের অনুসরণ করতে হবে। এই অনুপ্রেরণা তোমার আশেপাশের মানুষ বা তোমার প্রিয়জনের কাছ থেকেও আসতে পারে।

অলসতা কাজের ব্যাঘাত ঘটায়, শরীর ও মনে বিরূপ প্রভাব পেলে। ফলে মানুষ বিষণ্ণবোধ করে। তাছাড়া অলস মানুষ সমাজ-সংসারের কাছে অনেক বিদ্রুপের শিকার হয়। এসব থেকে বাঁচতে হলে পরিশ্রমী হতে হবে।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা তাদের দেখা অলস ব্যক্তিদের ব্যর্থতার চিত্র উল্লেখপূর্বক নিজেদের/পরিবারের সদস্যদের জীবনে পরিশ্রমের ফলে সফলতার গল্প উপস্থাপন করবে।

সুদ

সুদ আধুনিক অর্থ ব্যবস্থার এক মারাত্মক অভিশাপ। এটি ধনীকে আরো ধনী আর গরিবকে আরো গরিব বানিয়ে দেয়। ইসলামে এটি হারাম।

সুদ এর আরবি প্রতিশব্দ রিবা (اَلرِّبَا)। ঋণদাতা কর্তৃক ঋণগ্রহীতা থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করাকে সুদ বলে। সুদের পরিচয় দিয়ে মহানবি (সা.) বলেছেন-

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

অর্থ : 'যে ঋণ কোনো লাভ নিয়ে আসে তাই রিবা বা সুদ।' (জামে সগির)

সুদের লেনদেন দু'ভাবে হতে পারে। টাকার মাধ্যমে এবং পণ্যদ্রব্যের মাধ্যমে। উভয় প্রকারের লেনদেনে সময়ের বিনিময়ে অতিরিক্ত গ্রহণ করাকে সুদ বলে। রাসুল (সা.) হাদিসে ছয় প্রকারের পণ্যের নাম উল্লেখ করে বলেন- এগুলো সমান সমান নগদে নগদে বিক্রি করায় কোনো সুদ নেই, যদি কেউ আদান প্রদানে বেশি দেয় অথবা বেশি নেয় তাহলে তারা উভয়ে সুদের লেনদেন করল। গ্রহীতা এবং প্রদানকারী এক্ষেত্রে সমান।

সুদ হচ্ছে একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি। এটি সমাজকে কলুষিত করে ঝগড়া ও বিদ্বেষ ছড়ানোর মাধ্যমে। অপরদিকে সুদের বিপরীত হচ্ছে হালাল ব্যবসা, যা সমাজে শান্তি আনে। ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। তারা উভয়েই লাভবান হয়। আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন অপরদিকে সুদকে হারাম করেছেন। কুরআনের বাণী-

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْٓا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ

অর্থ: এটা এজন্য যে তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতো। অথচ আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। (সূরা আল বাকারা, আয়াত : ২৭৫)

মহানবি (সা.) সুদদাতা, গ্রহীতা, সাক্ষ্যদাতা, লেখক ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিশপ্ত ঘোষণা করেছেন। হাদিসে এসেছে–

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبَا ، وَمُوْكِلَهُ،
وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

অর্থ: 'রাসুল (সা.) সুদদাতা, গ্রহীতা, সুদ-চুক্তির লেখক ও সাক্ষীদ্বয়কে অভিশাপ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তারা সবাই সমান অপরাধী।' (মুসলিম)

সুদী কারবার বান্দাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ করে। আল্লাহ তা'আলা সুদ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। রাজাধিরাজ আল্লাহর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে পরাজয় সুনিশ্চিত।

সুদখোর যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। সুদ খেলে অন্তর কঠোর হয় এবং তাতে মরিচা পড়ে। সুদখোরের দোয়া ও ইবাদাত কবুল হয় না। আল্লাহ তা'আলা সুদের অর্থ দিয়ে সাদাকা করলে সেটা গ্রহণ করেন না। মহানবি

(সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা পবিত্র তিনি শুধু পবিত্র মালই গ্রহণ করেন।'

সর্বশেষ নাযিল হওয়া আয়াত হলো আয়াতুর রিবা বা সুদ বিষয়ক আয়াত। এতে বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলা চূড়ান্তভাবে সুদকে হারাম করেছেন। আয়াতটি হলো-

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا
إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

অর্থ : 'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমিন হও।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত : ২৭৮)।

এ ছাড়াও সুদের অনেক ক্ষতি রয়েছে যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। তবে আমাদের জন্য এতটুকু মনে রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা সেটাই হারাম করেন যার মধ্যে অনিষ্ট ও অকল্যাণ রয়েছে। যার বাহ্যিক লাভের চেয়ে চূড়ান্তভাবে ক্ষতিই বেশি। তাই আমরা সুদ থেকে বেঁচে থাকব।

শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তুমি/তোমরা একটি তালিকা তৈরি করো।

আখলাকে যামিমাহ	বর্জন করি	বর্জন করবো	অভিভাবকের মতামত/পরামর্শ
চুরি	অন্যের লেখা নিজের নামে প্রচার করি না।	বিদ্যালয়ে, চলার পথে কারো কোনো বস্তু পড়ে থাকলে সেটি নিবো না।	অসেচতনতাভাবে কারো কোনো বস্তু নিজের কাছে চলে আসলে মালিকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।
যুলুম			
সুদ			